ভারত মনীষা

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

ছেঁড়াপাতা

অনুবাদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন

ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

- সলিমুল্লাহ খানের ভূমিকা
  ভারতের শেষ স্বাধীন মানুষ–৯
- নতুন সংস্করণের ভূমিকা–১২
- অনুবাদকের কথা–১৩
- ছেঁড়াপাতা–১৭
- শেখ আলায়ি–২৫
- সার্মাদ শহিদ–৩৮
- সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি–৫৩

ছেঁড়াপাতা

আশ্চর্য! প্রকৃতির পথের দিশা, কী অপূর্ব তার অদৃশ্য হাতের কারসাজি! পথহারা উদাস মানুষের হাত ধরে টেনে নেওয়ার সেই পরম শক্তি। সুকর্মের সুযোগ যে করে দেয়—তার আকর্ষণী সেই কখন থেকে তার নিজের পানে আমায় টানছিল। কিন্তু অলস নিদ্রা আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। পরমের তীব্র কান্তি ছিল পূর্ণ স্বরূপে উদ্ঘাটিত, কিন্তু দৃষ্টির অস্পষ্টতা বাধা হয়েছিল। অবারিত দান ছিল উন্মুখ, কিন্তু অন্তর যারপরনাই বিমুখ।

প্রেমের ব্যর্থতা তার শেষ ও চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসল। আর তখনই খুলে গেল তার চোখ। চেয়ে দেখল তো দেখতে পেল—সবকিছুই বদলে গেছে। আগের সে আকাশ নেই, না পৃথিবী, না সেই আগের দিগন্ত, না প্রাণ। যে দুটো হাত ধরে এখানে আসা, সেই দুটোও অদৃশ্য। যেন সে এক প্রদীপ—যতক্ষণ রাতের আঁধারে চলছিলাম, পথ দেখাচ্ছিল। যখন ভোর হলো—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, নিবিয়ে দিলাম।

তন্দ্রাময় সেই জগৎ—যে দু-হাত ভরে বিলিয়ে যাচ্ছিল উদাসীনতার দান। হঠাৎ করে জেগে উঠল—চেতন হয়ে আমার চোখকে, সবাক হয়ে আমার কানকে অব্যাহতভাবে ডেকে চলল। যেন আমিও জেগে উঠি, হয়ে উঠি বাঙ্ময়। এখন দেখি জগতের কোনায় কোনায় কেবলই জাগৃতি। স্পন্দন যেন কানায় কানায় পূর্ণ। চারদিকে দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পাঠ।

অণু-পরমাণু তার কথা বলছে। পত্র-পল্লব যেন লিখিত লিপিকা। ফুলে ফুলে অশ্রুতপূর্ব গীতিকা। পাথরেরা পথ দেখায়। পায়ের নিচের ধূলিকণা এখানে উচ্চকিত হয়ে মাথার ওপর পাপড়ি ছড়ায়। আমার যত জিজ্ঞাসা তার জবাব দিতে আকাশেরা বারবার নেমে আসে। ধূলির ধরণিকে কতবারই না

উঠতে হয়েছে ঊর্ধ্বলোকে, কারণ একে যে আমার জন্য নক্ষত্র এনে দিতে হয়েছে। অবশ্য ফেরেশতারা তার হাত ধরে রেখেছিল—যাতে হোঁচট না খায়। প্রকৃতির নেকাব খোলা, যত পর্দা সব আজ সরিয়ে ফেলা। এদের সবার সম্ভ্রমে আজ পবিত্র ইঙ্গিত। চোখে সবার গল্পকথা। হাত পেতে আছে কিছু নেবে বলে। মেঘের হাত ধরলে দিয়ে গেল একরাশ শীতলতা। কাছে ডাকল বিজলিকে। রহস্যের ওপার থেকে ফুটে উঠলো এক ঝলক মুচকি হাসি। মুঠো ভরে বাতাস নিলাম, কিছুই পেলাম না। সাত-সমুদ্দুর ঢেলে দিল নিজেদের উজাড় করে, কিন্তু আমার হাতের পেয়ালা শূন্যই রয়ে গেল।

আমার পৃথিবীতে তখন রাত ছিল না। বহু সন্ধান করেও খুঁজে পাইনি এক টুকরো অন্ধকার। উন্নাসিকতার ঠিকানা কেউ দিতে পারল না, বহু খুঁজেও পেলাম না উদাসীনতার দেখা। চোখ বন্ধ করলেও অপূর্ব দৃশ্যের দেখা মেলে। কান বন্ধ করলেও শোনা গেছে বহু রাগ-রাগিণী। সূর্য বলে—আমি দুই লাখ মাইল দূরে আছি। আরও দূর থেকে একরাশ আলো ছুটে এসে বললো, আমি সেকেন্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল গতিতে ছুটে এসেছি।

কিন্তু চোখ বলল, এ তো আমার দৃষ্টির প্রথম ধাপ। দেখার শুরুই তো এখান থেকে। মন হেসে বলল, আমার প্রেমের বার্তা যখন চাওয়ার পাখায় ভর করে ওড়ে, তখন আলোর শক্তি কোথায়—আমার ডানার সঙ্গ দেয়। এককথায় ঘুমন্ত আশা জেগে উঠল। আর নতুন নতুন শক্তি অভিনব সব সাহস নিয়ে আমার কাছে ফিরে এল। হৃদয় ও দিগন্তে, প্রাণে ও জগতে কেউ এমন ছিল না যে ঘুমিয়ে থাকবে—ঘোমটা দিয়ে বা মুখ ফিরিয়ে।

জগৎ কারও জন্যে বদলে যায় না। বদলে যেতে হবে তোমাকেই। তবেই দেখবে—পৃথিবীও বদলে গেছে। ঘুম সব সময় ঘুম। উদাস নিদ্রা নিদ্রাই। এক পলকের অমনোযোগিতার সাজা এক জীবনের বিলাপেও শোধ হবে না। এরপরেও জীবনে যা ঘটে গেছে—এখন ভেবে দেখি—এ মহাজগতের সবকিছুর মতো এসবেরও দরকার ছিল। এসব কিছুই জীবন পথের দীর্ঘ ভ্রমণে একেকটি মন্‌জিল। লক্ষ্যে পৌঁছতে যা পাড়ি দিতেই হবে। যদি মায়ার এ জগৎ পাড়ি দিতে না হতো, সম্ভবত সত্যে পৌঁছা যেত না। আমি বলি, জগতের কিছুকেই নিরঙ্কুশ খারাপ বলা যায় না। মন্দ—একটি আপেক্ষিক

বিষয়। মূলত মন্দের পেছনেও শুভশক্তিই কার্যকর। সর্বাবস্থায় ফলাফলই বিচার্য। দৃশ্যত বা প্রথম দিকে পথ চলতে যে যতই হোঁচট খাক—পিছলে পড়ুক—দেখবে, গন্তব্যে পৌঁছল কি না।

১৯১৬ সালের ২৩ মার্চ বঙ্গীয় সরকার ডিফেন্স অ্যাক্ট ৩-এর ভিত্তিতে নির্দেশ দিলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে হবে। বছরের পর বছর একটানা বসবাসের সুবাদে মাতৃভূমি কোলকাতা ছেড়ে ৩০ মার্চ রাঁচি চলে যাই।

অনেক বন্ধু ও স্বজন সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু সাহসী হৃদয় সম্মতি দিল না। বিচ্ছিন্নতার এ সম্মানের গায়ে বন্ধুদের সঙ্গ কামনার দুর্বলতার দাগ লাগতে দিতে মন সায় দিল না। আমি জানি না—পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া সহজ না কঠিন। তবে চাদর ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে আমার কোনো কষ্ট হয় না। অনেক ভেবে দেখেছি—আমার আঁচল টেনে ধরার মতো কাউকে পাইনি। মনোসংযোগ ও হৃদয়ের প্রশান্তি মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছেড়ে যায়নি। বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের সাধনা এবার কিছুটা হলেও পূর্ণ হলো। হয়তো সামনে কাজে লাগবে।

যখন এ লেখা লিখছি—রাঁচিতে শহরের বাইরে মুরাবাদি নামের এক গ্রামে একাই থাকি। গোটা এলাকাটি ভারতের উপজাতীয় এলাকা। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এদের বাস। এরা কুল, ওড়াও, মুণ্ডা উপজাতি। আমার আশপাশে এরাই থাকে। অনুন্নত এ গ্রামে কেবল বাঙলিরাই চারপাঁচটি বাংলো বানিয়ে রেখেছে। কোনো কোনো সময় গ্রীষ্মে এসে থাকে। বিখ্যাত বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারও এখানে ছোট্ট একটি টিলায় এসে থাকে। প্রকৃতির পরম নিয়ন্তার অদ্ভুত আয়োজন বোঝা দায়। বহুদিন ধরে মুক্ত মনে চিন্তা ও তৎপরতার যে স্বাধীনতা খুঁজে ফিরছিলাম, ব্যস্ততা ও জনসম্পর্কের দরুন যা হয়ে উঠছিল না, এমনকি এজন্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম—সবই আজ পেয়ে গেলাম। তবে কীভাবে!

দুনিয়ার মানুষ খবর পেল আমার নির্বাসন ও নজরবন্দিত্বের। আর আমি পেলাম অরণ্যে একাকিত্ব যাপনের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। 'যেন কণ্টকাকীর্ণ স্বর্গ—হাদীসের ভাষায় : ভেতরে যার সুখের জগৎ—বাইরে কাঁটায় ঘেরা।'

এ সময়ই ধরায় নেমে এল রমজানের রহমতের ধারা। যদিও জামাতে নামাজ পড়ার সমাবেশ ও সুখানুভূতি আর তারাবীতে কোরআন শোনার হৃদয়হরা আকর্ষণ থেকে জীবনে প্রথমবারের মতো বঞ্চিত হই। এজন্য প্রথম প্রথম দু'চারদিন ভীষণ মন খারাপ ও অস্থিরতায় কাটে। কিন্তু এর পর পরই একাকিত্বের সাধনা, আত্মনিমজ্জনের সুখ এবং মনোজগতের লোকসমাগমে তন্ময়তার ভ্রমণ আমাকে এমন এক আবহে ঠেলে দেয়—যাতে করে আমি এই জগতের সমুদয় সঙ্গ ও সংঘের ঊর্ধ্বে চলে যাই। মন আর কিছুই চায় না—'রূপরে! আঁখি মুঞ্জিয়া দেখো রূপ'।

বিশেষ করে শেষ দশকের প্রত্যাশার দিবস ও কামনার রজনীগুলোতে প্রাপ্ত ক্ষমা ও সাফল্যের শুভবাণীগুলো হৃদয়কে যে তৃপ্তি দিয়েছে—ভাষার শক্তি কোথায় যে তা প্রকাশ করে! এ সময় আমার চোখ ও কান দৃশ্যের যে চমক লুটেছে—শ্রবণের যে ধারায় ভেসেছে—সেসব শোনার কানইবা কোথায়! তবে অতৃপ্তি থাকলে তা এটুকুই যে আমার পূর্ণ জীবনের সকল প্রশস্ততা যদি এই রমজানের এ শেষ দশকের মাঝে স্থান করে নিত এবং এই জীবনটিই আমি কাটিয়ে যেতাম।

মিলনের রাত খুবই ছোট;
নিয়তিকে বলি—
বিরহ রাতের একটি প্রহর
এতে এনে জুড়ে দাও।

এই পন্থের প্রতিটি প্রান্তে বিচিত্র সব আবহ থাকে। তুমি যদি সংঘ ও সান্নিধ্যের শাসন মানো, তবে সৌজন্য বলে দেবে—চুমুকে চুমুকে পানপাত্র শূন্য করো। অবশ্য তোমার তৃষ্ণা তোমাকে বলবে—সুরাহি হাতে এক পাশে কেটে পড়ো আর কানায় মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে খালি করে দাও পূর্ণ কলস। সঙ্গ-সোহবতে বসে ধীরলয়ে পানে একধরনের মজা। অন্যদিকে একাকিত্বের চাওয়া-পাওয়ার আরেক আলাদা জগৎ। যদিও এই দ্বিতীয় জগতের সাথেও আমি অপরিচিত ছিলাম না। তথাপি এখানে অনেক অপূর্ণতা ছিল। আর আজ নির্বাসিত জীবন এ পথে বহুদূর এগিয়ে দিল।

আল্লাহর শোকর! সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল—কোনো আওয়াজ না শ্রবণের আনন্দ মাটি করে, আর না সৃষ্টির আনন্দে আঘাত হানে কোনো দৃশ্য। বেশির ভাগ সময় লেখালেখিতে ব্যয়িত হয়, যার সবই ঐশী কিতাব ও পবিত্র সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এরপর যতদূর সময় মেলে তাও নষ্ট হয় না—দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, চারপাশ ঘেরা সবুজ পাহাড়।

আশ্চর্য কারবার! চেষ্টা ও প্রার্থনা কোনো কাজে আসে না। এখানে অবারিত দয়া ও দানেরই রাজত্ব। এ কয়মাসে আপনা থেকেই কত অসংখ্য দুয়ার খুলে গেল। অনেক সময় এমন হয়েছে—বিধান বদলাতে হয়েছে আর অতীতের বহু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবাদত মনে করে যে কাজ করেছি, সাফল্য স্পর্শ করেছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি, দেখি—তা ছিল মূর্তিপূজা। ঘরের দেয়াল ও তাক (শোকেস) প্রতিমা থেকে খালি কিন্তু সেই প্রতিমারা এখন যে পকেটে এবং জামার ভাঁজে ভাঁজে।

সময়কে কাল যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছি, আজ তা তারচেয়ে অগ্রসর। এরই মধ্যে নির্বাসনের নির্দেশ রহিত করার জন্য এমন কোনো চেষ্টা নেই—যা আমার বন্ধু ও ভক্তরা করেননি। ষাট হাজারেরও বেশি দস্তখত সংগ্রহ করে তারা স্মারক জমা দিয়েছেন। সম্ভবত এটি ভারতের ইতিহাসে প্রথম দৃষ্টান্ত।

বঙ্গীয় শাসকদের কারও কারও চিঠি ইতোমধ্যে আসতে শুরু করেছে—যা থেকে বোঝা যায় যে তারা তাদের ভুল বোঝাবুঝি স্বীকার করে নিতে চান। এরই মধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে স্বয়ং লর্ড কারমাইকেলও এমনই মত প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্দেশ প্রত্যাহারের আশাও দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে মনে এসবের কিছু প্রভাব তো পড়তই। কিন্তু পরে দেখলাম—মনের তৃপ্তি ও প্রশান্তির জন্য এসবের প্রভাবও কম ক্ষতিকর নয়। অবস্থা বলছিল বিধাতা অন্যরকম কিছু চাইছেন আর আমাকে পূর্ণ করার কাজ আরও একধাপ বাকি। যেখানে আমি থাকি সেখান থেকে শহর অনেক দূর। রমজানে জুমার দিনে বড় মসজিদে গেলাম। দুয়েক কাতারের বেশি লোক ছিল না। খুতবা ও ইমামতির জন্য লোকেরা জোর করে ধরল। বাধ্য হয়ে খুতবা দিলাম। ছাপানো কিতাব পড়ে দেওয়াকেই এরা খুতবা বলে জানে।

এখানে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট হলেও অঞ্চলটি বেশি প্রত্যন্ত হওয়ায় এদের অবস্থা খুবই করুণ। দরিদ্র ও অনুন্নত। জুমার নামাজের পর থেকে মাথায় একটি চিন্তা এল—মনে হলো, যদি বেশিদিন থাকতেই হয়—তাহলে এদের নিয়েই কোনো কাজ শুরু করব। জীবন বদলে দেবার কাজ। অবসর ও মুক্ত চলাফেরার সময় আমার কিছু কাজের নমুনা তো পৃথিবী দেখেছে। মনে হয়—নির্বাসন ও নজরবন্দিত্বের বন্ধুর জীবনেও অন্যরকম কিছু কাজের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া আন্তরিক তৎপরতার এটাই সময়।

লিখতেই ছিলাম। ডাকে পত্র এল। খবরের কাগজে দেখলাম—আমার স্নেহাস্পদ মৌলবি মুহিউদ্দিন আহমদ বি.এ-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্ভবত নজরবন্দী করে রাখা হবে। নির্বাসনের এই দিনগুলোতে আজই প্রথম মনটা অস্থির ও চিন্তাবিক্ষিপ্ত হলো। এই প্রিয় ব্যক্তিটি শুধু একা নয়, তাঁর গোটা পরিবার—তাদের ঈমান, ইসলামী চেতনা এবং আল্লাহর পথে ত্যাগ তিতিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত যুগের আদর্শ মানবকুলের উপমা। বিশেষ করে আমার এই স্নেহভাজন সত্যিকারের ভক্তি, উচ্ছ্বাস আর বহুমুখী প্রতিভার গুণে আমার অনেক আশা-ভরসার পাত্র হয়ে গিয়েছিল। আফসোস! ঘটনার ঘনঘটা তাকেও ছেড়ে কথা কয়নি।

এই কথা আমি কবে অস্বীকার করেছি যে—আমার দু'পায়ে একটি নয়, দশটি শিকল পরিয়ে দেওয়া হোক। অন্যদের কেন এতে জড়াতে হবে। দৃশ্যত এই মানুষটির এ ছাড়া আর কোনো অপরাধ নেই—সে আমার মতো এক হতভাগার সাথে উঠাবসা করে। আশ্চর্য! কী অদ্ভুত আমার উঠাবসা। কত চমৎকার বন্ধুবাৎসল্য। যতক্ষণ কেউ নিজের চরম শত্রু না বনে যায়, এই অপয়ার বন্ধু হতে পারে না। পরশু এক ভক্তকে চিঠি লিখতে গিয়ে দুটি লাইন মনে পড়ে গিয়েছিল।

এই আবেগ আর উচ্ছ্বাস খুবই সাময়িক ছিল।
একটু পরে আর সেই জীবন রইল কই;
পানশালায়ও সেই আশ্চর্য বিবর্তন!
না সুরায় নেশা আছে, না সাকির চোখে প্রাণ।

অতএব ধৈর্যই সম্বল। হয়তো একসময় এদের সবাইকে আমি আবার ফিরে পাব। কেননা, সেই পরমই তো বিপুল প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আধার। তাঁকে ঘিরেই তো আবর্তিত হয় পার্থিব সব মিলন ও বিরহ।

এই সব বিস্রস্ত পত্র তথা ছেঁড়াপাতা প্রিয়বন্ধু মিস্টার ফজলুদ্দিন আহমদের জোরাজুরিতে রচিত হলো। এ হচ্ছে—নিজের বিক্ষিপ্ত মন ও উড়ুক্কু অনুভূতির স্মারক। যদিও বহুবার ইচ্ছে করেছি কিন্তু গুছালো মন বা সময় এজন্য বরাদ্দ করতে পারিনি। শুরু থেকেই বিষয়টি এমন ছিল, ভীষণ ব্যস্ততার ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছি—দু'য়েক পাতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। না ধারাক্রম বাকি থেকেছে, না লেখকদের অভ্যাসমতো বিন্যাস, ভাগ-বিভক্তি অথবা পুনর্পাঠের সুযোগ। বইপত্র সব কোলকাতায়। লেখার কিছু কাগজ আর এক জিল্‌দ কোরআন শরীফ ছাড়া হাতে আর কিছুই নেই।

যখন এই কিতাব রচনা শুরু করি—তখন *তাজকিরাতুল ওয়াসিলিন*, *আখবারুল আখয়ার* ও *তবকাতে আকবরি* আনিয়ে নিই। একসময় *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*ও এসে যায়। অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় স্মৃতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সত্য বলতে কী—লেখার মতো মনও ছিল না। নানা জায়গায় প্রসঙ্গত তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, দর্শন ও ইতিহাসের আলোচনা এসে গেছে—যেগুলো কিতাব ছাড়া উদ্ধার করা সহজ নয়। বিশেষত হাদীস বর্ণনায় দোহাই-দস্তুর দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

কিন্তু আফসোস! কোনো কিতাবই কাছে নেই। আর উদ্ধৃতিগুলো একটি একটি করে প্রামাণ্য করা আর হাদীসগুলোর একটি একটি করে দোহাই-দস্তুর দেওয়ার সময় হয়তো আর কখনোই হবে না।

সুতরাং স্মৃতির সাহায্য নিয়েই লেখা শেষ করলাম। কোনো কোনো হাদীসের শব্দ নিয়ে স্মৃতি দুর্বল মনে হলে সেটারও উল্লেখ করেছি। দু'য়েক জায়গায় সূত্র উল্লেখ ছেড়েও দিয়েছি। এসব সত্ত্বেও আল্লাহর দয়ায় এটুকু আশা করি—যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি, যাচাইয়ের বেলায় ভুল সাব্যস্ত হবে না।

কোরআনের আয়াত আনার ক্ষেত্রে অভ্যাস এই যে লেখার টানে যে আয়াত এসে যায়—লিখে ফেলি। পরে প্রুফের সময় সুরা ও আয়াত নম্বর বসানো